পুরোনো কথা

(গল্পগ্রন্থ – কিন্নর দল)

বাল্যে সর্বদাই দেখতুম, বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার ঝগড়াবিবাদ চলেছে।

এর কারণ কিছু বুঝতুম না, আমার বয়স তখন সাত বছর। ঠাকুরমা যে বাবার মা এটা অনেকদিনই বুঝেছিলুম, কিন্তু মা ছেলেকে অমনি করে যে দিন নেই রাত নেই বকে, তার। কোনো নজীর আমার নিজের মায়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে খুঁজে পাই নি।

বুড়ো মানুষেই যে অমনি করে, তাও তো নয়; কারণ আমার দিদিমা ছিলেন ঠাকুরমার চেয়েও বেশি বয়সের। দিদিমার মাথার চুল পেকেছিল, ঠাকুরমার মাথার চুল তখনও অনেক কাঁচা। কিন্তু কই দিদিমা তো আমায় খুব ভালবাসতেন, কাউকে তো কখনও বকতে শুনি নি তাঁর মুখে। তবে কেন ঠাকুরমা এরকম করেন আমার বাবাকে? মাঝে মাঝে একথা ভেবেছি। কিন্তু সাত বছরের ছেলে, ভেবে কিছু ঠিক করতে পারতুম না, বা বেশিক্ষণ এসব কথা আমার মনে দাঁড়াতও না।

দিদিমার কাছে আমি অনেক সময় থাকতুম। তাঁর বাড়ি আমাদের গ্রাম থেকে নৌকায় যেতে হয়।অনেকখানি সময় লাগত সেখানে পৌঁছতে। সকালে খেয়ে বার হলে সেখানে পৌঁছাবার আগে রোদ রাঙা হয়ে আসত; বাদুড়ের দল ডানা ঝট্‌পট্‌ করে আকাশ দিয়ে উড়ে বাসায় যেত, নদীর জলে নৌকার ধারে ভুস্‌ভুস্‌ করে শুশুকেরা ডিগবাজি খেয়ে ডুব দিত।

এসব অনেক ছেলেবেলাকার কথা। তখন আমরা থাকতাম আমাদের দেশের বাড়িতে। সেখান থেকে অনেকদিন আমরা চলে এসেছিলুম, আর কখনও যাই নি। দেশে এখন আর আমাদের বাড়িঘর নেই, ম্যালেরিয়ায় জনহীন শ্রীহীন হয়ে গিয়েছে শুনেছি। বহুদিন কলকাতার বাসিন্দা, এখন সেসব জায়গায় যেতে ভয় করে, বিশেষ করে এখন যখন বয়স হয়েছে, সাবধানে থাকাই ভাল।

দেশের বাড়ির সঙ্গে মায়ের স্মৃতি জড়ানো। যখনই দেশের বাড়ির ডালিম গাছটা, তার পাশে লম্বা পেঁপে গাছটা, তার পাশে পুরোনো পাতকুয়ো ও গোয়ালঘরটার ছবি মনে আসে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি মনে আসে আমার মায়ের খুব অস্পষ্ট একটি ছবি।ওদের সঙ্গে মা যেন জড়ানো আছেন।

কি ভালোই বাসতুম মাকে! জীবনে অত ভালো কাউকে বাসিনি, বাসতে পারবও না।

মায়ের সম্বন্ধে আমার অতি শৈশবকালের যে ছবিটি জাগে, তাতেও দেখি ঠাকুরমা মাকে অনেক কষ্ট দিতেন, মাকে শক্ত কথা বলতেন অকারণে। ছেলেমানুষ হলেও আমি তা বুঝতুম; বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও শিশুর ইন্সটিংক্ট দিয়ে বুঝতুম; তার একটা মস্ত কারণ, মার প্রতি ছিল আমার গভীর দরদ ও সহানুভূতি, একই রক্ত একই মাংস আমার গায়ে। আমার চেয়ে মায়ের দুঃখ বুঝবে কে?

একদিনের কথা আমার মনে হয় অস্পষ্ট একখানা ছবির মত।

আমাদের বাড়ির সদর দরজার সামনে কিছু দূরে আর একজন কাদের বাড়ি ছিল। একটা খুব বড় ঝাঁকড়া লিচু গাছ ছিল তাদের বাড়ির বাইরের উঠানে। বিকেলবেলাটায়, আমি ও আরও অনেক ছেলে লিচুতলায় খেলছিলুম।

এমন সময় আমাদের বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে মা ডাক দিলেন, ভানু খাবার খাবি আয়।

খেলা ফেলে ছুটে গেলুম খেতে।

সদর দরজার ফ্রেমে মার ছবিটা আজও বেশ মনে হয়। দুদিকের কাঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, পরনে সাদা শাড়ি, মুখে হাসি। দরজার কবাট-জোড়ায় সেকেলে ধরনের মোটা পেরেকের গুল বসানো। পাশেই ছোট একটি চালাঘরে খড়বিচালি থাকত।

মা খেতে দিলেন মুড়ি মেখে। বেতের ছোট্ট ধামিতে মুড়ি নিয়ে খেতে বসেছি, এমন সময় নদীর ঘাট থেকে ঠাকুরমা ফিরলেন জল নিয়ে, এবং আমার হাতে মুড়ির ধামি দেখেই মাকে বকুনি ও গালাগালি শুরু করলেন।

ঠিক কথাগুলো মনে নেই, কিন্তু তার মোট মর্ম এই যে, বাড়িতে ওবেলা পুরুতঠাকুরের নিমন্ত্রণ ছিল একাদশী বলে, তিনি রুটি খেয়েছিলেন, তাঁর পাতে রুটি তরকারি রয়েছে, সেই পাতের রুটি তরকারি আমার জন্যেই ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছেন ঠাকুরমা।ঘাট থেকে আসতেও এমন কিছু দেরি হবে না, তখন এরই মধ্যে মুড়ির ঘড়া পেড়ে ছেলেকে সোহাগ করে মুড়ি খেতে দেওয়ার মানে কি?

আমায় বললেন, রাখ মুড়ি, পাঁচ-ছখানা রুটি পড়ে রয়েছে পাতে, ওগুলো উঠবে কি করে?

পরের পাতের ঘাঁটা জিনিস খেতে আমার ঘেন্না করে। কিন্তু ঠাকুরমার ভয়ে কিছু বলতে পারলুম না। ঠাকুরমা ঢাকা খুলে পাতের খাবার আমায় খেতে দিলেন। খাবার সময়েই আমার কান্না এল মায়ের কথা ভেবে। মিথ্যে মিথ্যে ঠাকুরমা মাকে বকলেন কেন? মা হয়তো জানত না পাতের খাবার ঢাকা আছে। ভাবলুম, মায়ের প্রতি এমন একটা কিছু দেখাব, যাতে মায়ের মনের কষ্ট দূর হয়, কিন্তু সাত বছর তখন আমার বয়স, না পারি কথা গুছিয়ে বলতে, না পারি কিছু বোঝাতে। হয়তো খুব শক্ত করে মায়ের গলা জড়িয়ে রাত্রে শুয়েছিলুম, এ ছাড়া সহানুভূতি দেখানোর অন্য কোন উপায় আমার জানা ছিল না সে বয়সে।

মধ্যে কিছুদিনের কথা আমার তত মনে পড়ে না, আমার যখন মায়ের কথা মনে পড়ে তখন মা'র খুব অসুখ। কি অসুখ জানতুম না তখন। নীচের একটা ঘরে মা থাকতেন, আমার মা'র কাছে যেতে সবাই বারণ করে দিয়েছিল। কিন্তু আমাকে ধরে রাখা সোজা কথা নয়, ফাঁক পেলেই আমি মার ঘরে ঢুকতুম, খানিকক্ষণ ধরে মা'র সঙ্গে কি সব কথা কইতুম। তারপর সন্ধান পেয়ে ওরা এসে ধরে নিয়ে যেত। ঠাকুরমার কাছে বকুনি খেতে হত ওঘরে যাওয়ার জন্যে।

এরকম চলল দু'দশ দিন নয়, অনেক—অনেকদিন, কতদিন তা আমার জানবার বয়স হয়নি। মোটের ওপর অনেকদিন। এখন মনে হয় সাত আট মাসের কম নয়।

একদিন শুনলুম মায়ের অসুখ নিয়ে বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার ঝগড়া হচ্ছে।

ঠাকুরমা বলছেন, আর ওর পেছনে পয়সা খরচ করে কি হবে? আমার ছেলেমেয়েগুলো কি পথে দাঁড়াবে? সংসারের টাকা দিয়ে দামী দামী ওষুধ এল কত এই ক-মাসে, তাতে কিছু যখন হল না, তখন আর আমি বেশি টাকা খরচ করতে দেব না।

বাবা বলছেন, তা বলে একটা মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরবে চোখের সামনে?

ঠাকুরমা বললেন, চিকিচ্ছে কম হয়নি কিছু। এখনও তো চিকিচ্ছের ত্রুটি নেই, কিন্তু আর আমি তোমায় টাকা দোব না। যে বাঁচবে না, তার পেছনে আর কেন টাকা খরচ?

সেদিন বুঝলুম, মার অসুখ খুব গুরুতর। মন খুব খারাপ হয়ে গেল, সমস্ত বাড়ির মধ্যে আমার মন টানে কেবল মায়ের ঘরে। যখন মন খারাপ হয়, মা'র কাছে গেলে সব দুঃখ চলে যায়। কিন্তু সেখানে যখন-তখন যাবার যো নেই। লুকিয়ে যেতে হবে, নইলে ঠাকুরমাকে পিসীমা বলে দেবেন। ছোটপিসীমা আমায় কোলে করে পুকুরধারে নিয়ে যাবে চলে। ওদেরসঙ্গে আমি তো জোরে পারি না!

পুকুরধারে বড় চাঁপাফুলের গাছ আছে। তার তলায় ছোটপিসীমা আমায় নিয়ে গিয়ে বলত, ওরকম যেও না যখন-তখন ও ঘরে; যেতে নেই। এখানে বস।

মা ভিন্ন সংসারটা আমার কাছে ফাঁকা। মা ছাড়া আর কিছু বুঝি না, আর কাউকে ভাল লাগে না—কেবল দিদিমা ছাড়া। দিদিমা নিতান্ত গরিব, আমার মা তার একমাত্র মেয়ে। মাঝে মাঝে তিনি যখন এসে আমাদের বাড়ি থাকতেন, রান্নাঘরের কাজকর্ম নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হত সদাসর্বদা। তিনি যেন এসে হতেন আমাদের বাড়ির রাঁধুনী। মায়ের অসুখের সময় তিনি এসেছিলেন, এবং রোগীর সেবা করবার জন্য তিনি ছাড়া আর লোক ছিল না।

মায়ের খাওয়ার আলাদা একখানা থালা, গেলাস ও বাটি ছিল। দিদিমা থালা বাটি রান্নাঘরের দাওয়ায় পেতে দাঁড়িয়ে থাকতেন মায়ের ভাতের জন্যে। মায়ের ঘরে থাকতেন বলেই বোধ হয় ইদানীং তাঁকেও আমাদের ঘরে-দোরে উঠতে দেওয়া হত না।

মায়ের ঘরে দিদিমা যা কিছু করবার সব করতেন, এজন্যে তাঁকে কেউ ছুঁতো না, তিনি ভাত খেতেন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে, নয়তো উঠোনের পেয়ারাতলায় বসে। তিনি থাকতেন এ বাড়িতে চোর হয়ে। মায়ের অসুখের কি ওষুধপত্র নিয়ে কথা বলতে যেতে ঠাকুরমার কাছে তাঁকে কতবার বকুনি খেতে হয়েছে।

ঠাকুরমা বলতেন, অত যদি দরদ মেয়ের ওপর, নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিকিচ্ছপত্তর করাও গে। জামাইকে তো দিনরাত জপাচ্ছ হুগলী থেকে ডাক্তার আনতে, পয়সা দেবে কে? তোমার কি, একটা মোটে মেয়ে, সস্তায় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছ। আমার এখনও আইবুড়ো মেয়ে ঘরে, তোমার মেয়ের জন্যে তাকে তো আমি জলে ভাসিয়ে দিতে পারি না। যে ক'টা টাকা আছে, তা এখন তুলে রেখে দিতে হবে ওর ঘর-বর দেখে দিতে; এতে তোমার মেয়ের ভাগ্যে বাপু যা থাকে।

দিদিমাকে কতদিন পুকুরঘাটের চাঁপাতলায় বসে একা হাপুস নয়নে কাঁদতে দেখেছি। এ রকম কতদিন যে কাটল! কতদিন যে মায়ের ঘরে যেতে পারলুম না! মা দিন দিন যেন বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগলেন। মায়ের ঘরের দোর সর্বদাই বন্ধ। আমি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতুম, মা একা ঘরের মধ্যে বিছানায় অঘোর হয়ে অচৈতন্য শুয়ে। দিদিমা হয়তো মায়ের ছাড়া কাপড় নিয়ে কাচতে গিয়েছেন।

আমি আস্তে আস্তে ডাকতুম, ও মা, মা ! তারপর দোর ঠেলে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করতুম। অমনি ছোটপিসীমা কোথা থেকে এসে আমায় ছোঁ মেরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন।

—বাবা কি দস্যি ছেলে! এক দণ্ড যদি চোখের আড় করবার জো আছে! ঘুরছেন সর্বদা মা'র কাছে যাবার জন্যে, বারণ করে দিইছি না তোমায়?

ঠাকুরমা চেঁচিয়ে বলে উঠতেন, দে আচ্ছা করে দু'ঘা কষিয়ে। পরের ছেলে খায় বনপানে ধায়; যতই কর, ছেলের সর্বদাই মা, মা আর মা!

বড়পিসীমা মাকে সত্যিকার ভালবাসতেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল এই গাঁয়েই। পিসেমশায়ের অবস্থা বোধ হয় ভাল ছিল না, বড়পিসীমাকে ভাল কাপড়-চোপড় পরতে দেখি নি কোনও দিন। ঠাকুরমার সঙ্গেও বোধ হয় তাঁর তেমন ভাব ছিল না। তিনি কিন্তু মাঝে মাঝে এসে মায়ের কাছে বসে থাকতেন, দিদিমা বাদে তিনি আর বাবা ছাড়া মায়ের ঘরে আর কেউ ঢুকত না।

বাবার কোন কথা বলবার যো ছিল না। মায়ের অসুখের সম্বন্ধেকিছু বললেই ঠাকুরমার সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেত। একদিন সকালে উঠেই শুনলুম ঠাকুরমাতে আর বাবাতে তুমুল তর্ক চলছে।

ঠাকুরমা বলছেন, চান্দ্রায়ণ প্রাচিত্তির না করলে আমার বাড়িতে অকল্যেণ হবে। তোমারবউ তো একা নয়, আমার আরও লোকজন নিয়ে ঘরকন্না করতে হয়। পুরুতঠাকুর বলে গিয়েছেন, প্রাচিত্তির করাতে হবে এই একাদশীর দিন।

বাবা বলছেন, বল কি মা? ও কালও বলেছে, হ্যাঁগো আমি বাঁচব তো? আমি বলেছি, কেন বাঁচবে না? এবার ডাক্তার বলেছে, সেরে উঠবে। চান্দ্রায়ণের নাম শুনলেই ও ভয়ে খুন হয়ে যাবে। যার এখনও এত বাঁচবার ইচ্ছে, তাকে কি করে প্রাচিত্তির করানো যায় মা? ও তাহলে ভয়ে মরে যাবে।

ঠাকুরমা বললেন, আর এমনিই যেন বাঁচবে! দুদিন আগে আর দুদিন পাছে! তোর লজ্জা করে না বোয়ের কথা বলতে আমার সামনে? মুখের লাগাম আলগা করে দিয়েছ যে একেবারে! এক কড়ার মুরোদ নেই, আবার কথাবার্তা শোন গুণধর ছেলের? সোজা কথা বলে দিচ্ছি, প্রাচিত্তির না হলে ওই রোগের মড়া কেউ বার করতে আসবে ঘর থেকে!

বাবা বললেন, চুপ চুপ, শুনতে পাবে ও ঘর থেকে। আচ্ছা মা, তোমার কি একটু দয়াও হয় না—ও মরণের ভয়ে কালি হচ্ছে যাচ্ছে, দু'বেলা একে ওকে বলছে আমি বাঁচব তো, আর তুমি কি বলে ওর কানের কাছে—

এর উত্তরে ঠাকুরমা চীৎকার করে বিপরীত কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন।

যাই হোক, বাবার কোনও কথা বোধ হয় খাটল না, কারণ একদিন মায়ের ঘরে কি সব পুজো-আচ্চার যোগাড় হল, পুরুতঠাকুর এলেন ওপাড়া থেকে। তিনি কালীর বাবা, আমি তাঁকে চিনি, কালী আমাদের সঙ্গে খিড়কিবাগানে কত খেলা করেছে, ভারি ছুটতে পারে, তার সঙ্গে ছুটে কেউ পারি না আমরা। সে এখন এখানে নেই, তার মামারবাড়িতে গিয়েছে।

বড়পিসীমা বলছিলেন হরি গয়লানীর কাছে, সে আমাদের দুধ যোগান দেয়।

—আহা। বলছি পুরুত আসছেন, তোমার একটা স্বস্ত্যেন করাতে হবে কিনা। বউয়ের মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। বলছে, কেন ঠাকুরঝি, তবে কি আমি বাঁচব না? তখন আবার বোঝাই, বলি, তা কেন, স্বস্ত্যেন করলে তোমার অসুখ সারবে, ভয় কি! আহা, ছেলেমানুষ, এই সবে বাইশ বছরে পা দিয়েছে, ওর এখনও কত সাধ জীবনে, বাঁচবার কি ইচ্ছে পোড়াকপালীর!

দিন দশ-বারো পরের কথা।

পাশেই এপাড়ায় সন্তুদের বাড়ি। সন্তুর দাদা বিয়ে করে নতুন বউ এনেছে। তাদের বাড়িতে সবাই গিয়েছে বউ দেখতে। খুব বাজি-বাজনা করে বিয়ে করতে গিয়েছিল সন্তুর দাদা। এক—একটা হাউইবাজি যেন গিয়ে একেবারে আকাশে ঠেকে।

বাড়ির সবাই গিয়েছে। দিদিমা যান নি, রাত জাগেন বলে তিনি ও-বারান্দায় আঁচল পেতে ঘুমোচ্ছেন।

আমি চুপিচুপি মায়ের ঘরে ঢুকে মায়ের কাছে গিয়ে বসলুম। মায়ের কাছে আসবার লোভেই বউ দেখতে যাই নি, বাগানে গিয়ে লুকিয়ে ছিলুম; নইলে ছোটপিসীমা অনেক ডাকাডাকি করেছিল।

মা বেশি কথা বলতে পারেন না। আমি চুপ করে মায়ের বিছানায় শিয়রের পাশটিতে বসে আছি। বেলা বেশি নেই। পুকুরধারের চাঁপা গাছে রোদ রাঙা হয়ে এসেছে।

খানিকটা পরে মা বললেন, খোকা, আমি যদি মরে যাই, তুই কি করবি?

আমি কিছু বললুম না, চুপ করে রইলুম। আমার মনে একটা অদ্ভুত ধরনের বিষাদ।

আর কখনও এ ধরনের ভাব আমার মনে হয় নি। ভয়ানক মন-কেমন করছে কার জন্যে—কার জন্যে যে বুঝতেও পারি না।

মা যেন আপনমনেই বলছিলেন, খোকা, তোকে যে কার কাছে রেখে যাব সেই হয়েছে আমার ভাবনা। কেই বা তোকে বুঝবে!

হঠাৎ মা তাঁর হাতের আংটিটা খুলে আমায় দিয়ে বললেন, যা, এটা লুকিয়ে রেখে দিগে যা, ওরা তোকে কিছু দেবে না। এটা দিয়ে কিছু মিষ্টিটিষ্টি কিনে খাস, তুই ভালবাসিস পক্কান্ন মেঠাই, তাই খাস। কাউকে দেখাস নি।

এই সেই আংটি, আমার হাতে এখনও রয়েছে।

আমার বন্ধু চুপ করল। আবার চোখে জল এল। বহুকাল আগেকার এক রোগজীর্ণ তরুণী মায়ের ছবি মনে এল—অসহায় বন্ধুহীন সংসারে যার একমাত্র অবলম্বন ছিল সাত বছরের ছেলেটি আর দুর্ভাগা স্বামী।

আমার বন্ধু এখন খুব বড়লোক, অনেকগুলো কয়লার খনির মালিক। তার সার্কুলার রোডের বাড়িতে বসে চা-পানের পরে সন্ধ্যাবেলা আমরা কথা বলছিলুম।

তারপরে সে ওপরের গল্পটা বললে।

খানিকটা চুপ করে থেকে আমি বললুম, তারপর কি হল?

রাত্রে কি হয়েছিল আর জানি না। ওরা এসে পড়বার পরেই আমি ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলুম। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরে উঠে মাকে আর দেখি নি। আমার ছেলেবেলাকার মা রাত্রের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই রকম সন্ধ্যায়, আবার সেই কতকাল আগের কথা—সেই সন্ধ্যাটি আমার মনে আসে।